বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২২৭-২৩৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

করোনায় (কোভিড-১৯) শিল্প-সংস্কৃতির অর্থনীতি: প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র ও যাত্রা শিল্প

মিহির কুমার রায়*

১. চলচ্চিত্র: জীবন-জীবিকা যেখানে বড় প্রশ্ন

চলচ্চিত্র নিয়ে ভাবনা কিংবা গবেষণা তেমন গুরুত্ব পায়নি কোনো আমলেই বিশেষত শিক্ষার উপকরণ হিসেবে। যদিও বিনোদনের উপকরণ হিসেবে এর কদর সবসময়ই ছিল। আবার দেখা যায়, বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের কৃতী পুরুষ হিরালাল সেন বাংলার চলচ্চিত্রের ইতিহাসের প্রথম পথপ্রদর্শক এবং তিনি ১৮৯৮ সালে রয়্যাল বাইস্কোপ নামে একটি কোম্পানি গঠন করেন। তারপর তিনি বাংলাদেশের ভোলা জেলায় ৪ এপ্রিল, ১৮৯৮ সালে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন মহকুমা প্রশাসকের ডাকবাংলোতে এবং এর পরপরই ঢাকার সদরঘাটে অবস্থিত ক্রাউন থিয়েটারে ১৭ এপ্রিল, ১৮৯৮ সালে বর্ডফোর্ড সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানির আয়োজনে একটি সিনেমার প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। আবার ২১ আগস্ট, ১৯০৩ কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল, রয়্যাল বাইস্কোপ কোম্পানি জবা-কুসুম অয়েল নামে একটি ফটোগ্রাফির স্লাপ নেয়, যা হিরালাল সেনের প্রথম প্রচারমূলক ফ্লি। সেন তার জীবদ্দশায় ১২টি ক্ষুদ্রকায় ফিল্ম, ১০টি ডকুমেন্টারি এবং ৩টি অ্যাডভারটাইজমেন্ট ফিল্ম তৈরি করেছিলেন। এর পরপরি আসে ঢাকাইয়া চলচ্চিত্র, যেখানে ঢাকার নবাব পরিবার ঢাকা ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ সোসাইটি নামে একটি প্রোডাকশন হাউজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান দুটি ফিল্ম তৈরি করে প্রদর্শন করেছিলেন, যার নাম হলো যথাক্রমে 'সুকুমারী' (স্বল্পদৈর্ঘ্য ৪ রিল, ১৯২৭-২৮ সাল) এবং 'দ্য লাস্ট কিস' (দৈর্ঘ্য ১২ রিল, ১৯৩১ সাল)। এ দুটিই ছিল শব্দ ও কথোপকোথনবিহীন ছবি, যার পরিচালক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের ক্রীড়াশিক্ষক অম্বোজ গুপ্ত। তখনকার সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রখ্যাত ইতিহাসবিক অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মজুমদার 'দ্য লাস্ট কিস' শোটির শুভ উদ্বোধন করেছিলেন মুকুল সিনেমা হলে (যা বর্তমানে আজাদ সিনেমা হল)। সিনেমাটি প্রায় একমাস প্রদর্শিত হয়েছিল।

তারপর ১৯৪৭ এর ভারত বিভক্তি এবং পূর্ব পাকিস্তন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা হওয়ায় নতুন করে সাংস্কৃতিক চর্চা শুরু হয় বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম উদ্যোগক্তাদের সহযোগিতায়। আব্দুল

* অধ্যাপক (অর্থনীতি), ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা;
ই-মেইল: mihir.city@gmail.com

জব্বার খান ১৯৫৪ সালে 'মুখ ও মুখোশ' ছবির কাজ শুরু করেছিলেন, যা মুক্তি পায় ৩ আগস্ট ১৯৫৬ সালে, যা বাংলা সিনেমার জগতে একটি উজ্জ্বলতম পদক্ষেপ বলে বিবেচিত। সবাক চলচ্চিত্র হিসাবে যদি এটিকে ভিত্তি ধরা হয়, তবে ৬০ বছর পাড় করেছে এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্প। সেই সময় প্রয়োজন দেখা দিল একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর এবং যুক্তফ্রন্ট তখন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতায় আসীন, যার বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান, যা ১৯৫৭ সালের কথা। যখন এ দেশে মাত্র যে কয়েকজন মানুষ চলচ্চিত্র নির্মাণের চিন্তাভাবনা শুরু করছলিনে। বঙ্গবন্ধুও তাদের সহযাত্রী ছিলেনে। পাকিস্তান শাসনামলে চলচ্চিত্র সচেতন কয়েকজন ব্যক্তি চলচ্চিত্র সম্পর্কে নানা সমস্যার প্রসঙ্গ উত্থাপনপূর্বক বঙ্গবন্ধুর কাছে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করছিলেন। ফলে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধু এই অনিবার্যতাকে উপলব্ধি করেই চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন। যারা বঙ্গবন্ধুর কাছে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার তদবির করতে গিয়েছিলেন, তাদের অবাক করে দ্রুত সংশ্লিষ্টদের বসিয়ে ওয়ার্কিং পেপার প্রস্তুত করে দিতে বলেছিলেন। চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এই উত্তেজনায় তারা দ্রুতই ওয়ার্কিং পেপার বঙ্গবন্ধুর কাছে জমা দেন। এফডিসি প্রতিষ্ঠার জন্য যাদের অদম্য আগ্রহ ছিল, তাদের অন্যতম ছিলেন নাজির আহমদ। তিনি লিখেছিলেন, "আমার স্পষ্ট মনে আছে। অধিবেশনের শেষ দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইপিএফডিসি ও ইপসি প্রতিষ্ঠার জন্য একহাতে দুটি বিল পরিষদে অনুমোদনের জন্য পেশ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাধায় বিলটি পাস হয়ে যায়। তখন উৎফুল্ল শেখ সাহেব বলেছিলেন "এফডিসি তো হয়ে গেল, আসগর আলী শাহকে চেয়ারম্যান বানিয়ে দিয়েছি ও আবুল খায়েরকে এমডি। এখন চলচ্চিত্রেরে জন্য কাজ করুন গিয়ে।' তাঁর উৎসাহ না থাকলে বোধ হয় এ দেশে এফডিসিরি জন্ম হতো না। আর হলেও হতো অনেক দেরিতে। বর্তমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও চলচ্চিত্র ভালোবাসেন বঙ্গবন্ধুও ভালোবাসতেনে। জাতির পিতার হাতেই এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙালির নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর বৈচিত্র্যময় উদ্যোগের একটি এফডিসি প্রতিষ্ঠা। এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর ফাতেহ লোহানী পরিচালিত প্রথম ছবি 'আকাশ আর মাটি' (১৯৫৯)ও দ্বিতীয় ছবি 'আসিয়া' মুক্তি পায় ১৯৬০ সালে, যা তদানীন্তন পাকিস্তান শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবি হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ দেশে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হলেও এই শিল্পটি সর্বদা সঠিক পথে চলতে পারেনি। স্বাধীন দেশের চলচ্চিত্র শিল্প নিয়েও বঙ্গবন্ধুর উদ্বিগ্নতা আমরা দেখেছি। দুষ্ট ব্যবসায় বুদ্ধির বিপরীতে স্বাধীন দেশের চলচ্চিত্র শিল্পটও স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে পারেনি। ১৯৫৯ সালে আরও মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল 'এ দেশ তোমার আমার', 'মাটির পৃথিবী' ইত্যাদি। তারপর একে একে রাজধানীর বুকে (১৯৬০), হারানো সুর (১৯৬১), যে নদী মরু পথে (১৯৬১), কখনো আসেনি (১৯৬১), তোমার আমার (১৯৬১), জোয়ার এলো (১৯৬২), নতুন সুর (১৯৬২), সোনার কাজল (১৯৬২), সূর্য স্নান (১৯৬২), ধারাপাত (১৯৬৩), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), নাচঘর (১৯৬৩), তালাশ (১৯৬৩), বন্ধন (১৯৬৪), মেঘ ভাঙ্গা রোদ (১৯৬৪), মিলন (১৯৬৪), অনেক দিনের চেনা (১৯৬৪), সঙ্গম (১৯৬৪), সুতরাং (১৯৬৪), আখেরি স্টেশন (১৯৬৫), বাহানা (১৯৬৫), একালের রুপকথা (১৯৬৫), গুধুলির প্রেম (১৯৬৫), জানাজানি (১৯৬৫), কাজল (১৯৬৫), মালা (১৯৬৫), নদী ও নারী (১৯৬৫), সাগর (১৯৬৫), সাত রং (১৯৬৫), ডাক বাবু (১৯৬৬), কাগজের নৌকা (১৯৬৬), কার বউ (১৯৭৬৬), মহুয়া (১৯৬৬), আয়না ও অবশিষ্ট (১৯৬৭), আনোয়ারা (১৯৬৭), আলীবাবা (১৯৬৭), চাওয়া-পাওয়া (১৯৬৭), চকুরী (১৯৬৭), নবাব সিরাজদৌল্লা (১৯৬৭) ইত্যাদি। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান ১৯৬৪ সালে প্রথম একটি উর্দু ছবি সঙ্গম তৈরি করেছিলেন এবং পর্যায়ক্রমে তারই পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

জীবন থেকে নেওয়া (১৯৭০), স্টপ জেনোসাইড (১৯৭২) ইত্যাদি মুক্তি পেয়েছিল। সেই সময়ে বাংলার লোককথাভিত্তিক চলচ্চিত্র মনোমুগ্ধকর ছিল। এরপরও ষাটের দশকে এ দেশে অনেক ভালো ছবি তৈরি হয়েছিল, যা প্রেক্ষাগৃহে বসে পরিবার নিয়ে দেখার মতো ছিল। সেসব ছবির নায়ক-নায়িকায় জুটি হিসাবে ছিলেন শবনম-রহমান, নাদিম- শাবানা, সুভাস দত্ত-কবরী, আজিম-সুজাতা, রাজ্জাক-সুচন্দা, সুলতানা জামান-আমীর হোসেন প্রমুখ।

তারপর দীর্ঘ সময়ের পথপরিক্রমার পর স্বাধীনতত্তোর বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে একটি মিশ্র ফলাফল লক্ষ করি এবং বিচার বিশ্লেষণে সত্তরের দশকটি ছিল এই শিল্পের সোনালী যুগ। যদিও এর পরে অনেক ভালো ছবি তৈরি হয়েছে। যেমন আদম সুরত, মাটির ময়না, আগুনের পরশমণি, শ্রাবন মেঘের দিন, ওরা এগার জন, গেরিলা, সংশপ্তক, নীল আকাশের নিচে, গোলাপী এখন ট্রেনে, বিন্দু থেকে বৃত্ত ইত্যাদি। তারপর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রজোজনায় অনেক ভালো ছবি তৈরি হয়েছে। যেমন পালঙ্ক, তিতাস একটি নদীর নাম, পদ্মা নদীর মাঝি, মনের মানুষ, শঙ্খচিল, দহন ইত্যাদি। তবে এরপর চলচ্চিত্র অঙ্গনে সৃষ্ট নানা সংকট এখনো কাটেনি বিভিন্ন পলিসিগত কারণে, যা কোনোভাবেই আমাদের শিল্প-সংস্কৃতির সাথে সহায়ক ছিল না। এর ফলে দর্শক সিনেমা হল-ভিত্তিক না হয়ে ঘরমুখী হয়েছে। ভালো ছবি না আসায়, তারা টিভি সিরিয়াল উপভোগ করেছে পরিবার নিয়ে। বিশেষত কলকাতাভিত্তিক বাংলা সিনেমাগুলোর বিষয়ে প্রটেকশনের নামে চলচ্চিত্রের শৈশবকে আমরা প্রলম্বিত করছি মাত্র, সাবালক হতে দিইনি এবং অগণিত দর্শকের অধিকার রয়েছে সিনেমা হলে গিয়ে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন স্বাদের চলচ্চিত্র উপভোগ করার, যেখানে সুদূর আমেরিকা থেবে ছবি আমদানি হলে প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ভারতের ছবি কেন আসতে পারবে না। ২০০৬ সাল থেকেই খোদ পাকিস্তানেই ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন শুরু হয়েছে এবং ২০০৫ সালে যেখানে সারা পাকিস্তানে ২০টি সিনেমা হল ছিল, বর্তমানে তা ২০০ অতিক্রম করেছে। বড় বড় শহরে তৈরি হয়েছে মাল্টিপ্লেস। স্থানীয় চলাচ্চত্র নির্মাণে এসেছে পরিবর্তন, যা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রেখেছে ভারতীয় চলচ্চিত্রে। বাংলাদেশের চেয়ে দুর্বল অর্থনীতির দেশ নেপালেও ১৮০টি সিনেমা হলের মধ্যে ৫৮টি সিনেপ্লেস রয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যেখানে ১২০০ সিনেমা হল ছিল, যা ২০২০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৯৪ টিতে (সূত্রঃ ইউএনবি নিউজ, সেপ্টেম্বর,২০২০)।

১.১. চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশে সরকারি নীতি

অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ১ হাজার কোটি টাকার তহবিল ঘোষণা করেছেন। চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট অবকাঠামো নির্মাণ এবং উন্নয়নের জন্য অল্প সুদে এই তহবিল ব্যয়িত হবে । চলচ্চিত্র নির্মাতারা প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ যদি মেনে চলেন, তাহলেই হয়তো হয়ে উঠবে আমাদের ভালো চলচ্চিত্র। বর্তমান সমাজের বিভিন্ন ইস্যুকে সিনেমাতে তুলে এনে সামাজিক বার্তামূলক চিত্রনাট্য হলে সেটা অনেকেই দেখতে চাইবেন। এখনকার সিনেপ্লেক্সগুলোতে যখন মানুষ যায়, তখন বাংলা থেকে ইংরেজি সিনেমাই বেশি দেখতে যায়। কারণ সিনেপ্লেক্সেএ খুব কম বাংলা সিনেমা দেখানো হয়। আর হলেও অত টাকা খরচ করে বাংলা সিনেমা দেখতে ইচ্ছা করে না। কারণ, একটা বাংলা সিনেমা শুরু হলে গল্পের শেষে কী হবে তা আগেই আঁচ করা যায়। আমাদের ভালো কনটেন্টের অভাব হওয়ার কথা নয়। মোগল-ব্রিটিশ-পাকিস্তান বিজয় করা বাংলাদেশিদের বহু ভালো বিষয় আছে। জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নানা চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়ে আসছে। এ দেশের সুস্থধারার চলচ্চিত্রগুলোর

মধ্যে একটি বড় অংশজুড়ে আছে এই মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্রগুলো। ওরা ১১ জন, সংগ্রাম, একাত্তরের যীশু, হাঙ্গর নদীর গ্রেনেড সিনেমাগুলোতে যেমন উঠে এসেছে যুদ্ধের ভয়াবহতা, তেমনি আছে নিজ জন্মভূমিকে ভালোবাসার এক অকৃত্রিম টানের চিত্র। শিশুদের জন্য সিনেমা নির্মাণ হওয়ার সময়ের দাবি। শিশুতোষ চলচ্চিত্র বা অ্যানিমেশন অভাবে আমাদের সোনামণিরা বিদেশি অ্যানিমেশন বা কার্টুন-গেমসে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো সুস্থ চলচ্চিত্র বিমুখ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সরকার ২০১২ সালের ২ এপ্রিল এক নির্বাহী আদেশে চলাচ্চিত্রকে শিল্প ঘোষণা করেছে, যাতে উল্লেখ আছে অন্যান্য শিল্পের মতোই যাবতীয় সুযো-সুবিধা পায় এই শিল্প। কিন্তু এই শিল্পের সাথে সংশিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানিকারকরো কোনো সুযোগ-সুবিধাই পাচ্ছেন না। চলচ্চিত্র শিক্ষায় সংকট এই শিল্পের বড় দর্বলতা। সম্প্রতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পাঠদান ও গবেষণা মাত্র শুরু হয়েছে যার সুফল পেতে আমাদের আরও অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। কারণ, এসব শিক্ষার্থীর কতজনই বা এই শিল্পের সাথে যুক্ত থাববে, তা এখনো ভেবে দেখার বিষয়। সরকারের ফিল্ম আর্কাইভ ও ইনস্টিটিউট কী কাজ করছে, তা বোঝা যায় না। দেশের নায়ক-নায়িকা যারা বর্তমানে এই শিল্পে কাজ করছেন, তাদের অনেকেরই প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রশিক্ষণ নেই বললেই চলে। ঢাকার কবীরপুরে বঙ্গবন্ধু ফিল্ম ইনস্টিটিউট করার কথা সরকারের রয়েছে, যেটিকে ভারতের পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আদলে যদি করা গেলে চলচ্চিত্র শিক্ষা ও গবেষণা অনেক গতি পাবে। কারন, চলচ্চিত্র হচ্ছে সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, আলোকচিত্র ইত্যাদির মৌলিক শিল্প মাধ্যমের একটি রূপ।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, "চলচ্চিত্র শিল্প আজ নানামুখী সংকটের মধ্য দিযে যাচ্ছে এটি সঠিক। কিন্তু এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। চলচ্চিত্র শিল্পীদের বহুদিনের দাবি প্রধানমন্ত্রী পূরণ করেছেন। চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিনেমা হল পুনর্নির্মাণ, বন্ধ হল চালু করা ও নতুন হল নির্মাণের জন্য ১ হাজার কোটি টাকার বিশেষ তহবিল গঠিত হয়েছে।" এখন দেশ করোনায় আক্রান্ত, যার ফলে ১৮ মার্চ, ২০২০ থেকে সিনেমা হল বন্ধের সরকারি নির্দেশনা জারি হয়েছিল এবং প্রায় আট মাস পর খুলছে সিনেমা হল যা শুক্রবার ১৬ অক্টোবর,২০২০, থেকে হলগুলোতে সিনেমা প্রদর্শনীর অনুমতি দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয়। তবে অনুমতি মিললেও আশানুরূপ দর্শক না হওয়ার আশঙ্কায় ছবি মুক্তি দিতে চান না প্রযোজকেরা। আর নতুন ছবি না হলে অনেক মালিকই হল খুলবেন না। তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, "কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে সিনেমা হলের আসনসংখ্যা কমপক্ষে অর্ধেক খালি রাখার শর্তে এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" কয়েক মাস ধরেই চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা সরকারের কাছে আবেদন করে আসছেন সিনেমা হল খোলার জন্য। হল খোলার অনুমতি মিললেও সিনেমা প্রদর্শনীর জন্য কতটা প্রস্তুত হল মালিকেরা কিংবা সিনেমা মুক্তি দিতে প্রযোজকেরা কতটা আগ্রহী—এ প্রশ্ন এখন চলচ্চিত্রাঙ্গনে। এখন প্রধানমন্ত্রী এই শিল্পের জন্য যে প্রণোদনা ঘোষণা দিয়েছেন, তার সফল বাস্তবায়ন হোক এই প্রত্যাশা রইল।

২. লোকজ সংস্কৃতির বাহক যাত্রা শিল্প

২.১ যাত্রা শিল্পের বিবর্তন: বিশ্বয়ানের আকাশ সংস্কৃতি বাঙালির এককালের বিনোদনের প্রধান বাহক যাত্রাপালাকে গ্রাস করে বসেছে অথচ যাত্রার কথা মনে হলে পুরানো ইতিহাস, মহষী ব্যাক্তিত্ব, লোকজ সাহিত্য, বিখ্যাত চরিত্র ইত্যাদির কথা মানস পটে ভেসে উঠে । রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলেছিলেন,

যাত্রায় লোকজ শিক্ষা হয়। মহানায়ক উত্তম কুমার বলেছিলেন, যাত্রা হলো একটি মোটা দাগ এবং তিনি তার মাত্র ১৩ বছর বয়সে জীবনসঙ্গীনি বইতে বলরামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কলকাতার জনতা অপেরায় । উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'-এর চিত্রনাট্য রূপ দিয়েছিলেন অস্কারজয়ী বাঙালি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় । এই চলচিত্রে একটি যাত্রাপালা রয়েছে, যা সার্বিক কাহিনীকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। এই আদি লোকজ সংস্কৃতি সূচনা হয় খ্রিষ্টপূর্ব কয়েক হাজার বছর আগে, যখন মানুষ দেবদেবীর বন্দনা করত এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাত্রা ঘুরে বেরাত। গ্রামাঞ্চলে প্রবাদ আছে 'মঙ্গলের ঊষা যাত্রা বোধের পা যথা ইচ্ছা তথা যা'— এখান থেকেই যাত্রা কথাটির উৎপত্তি।

তথ্য বলছে, ১৫০৯ সালে যাত্রার সাথে অভিনয় যুক্ত হয় শ্রী চৈতন্য দেবের সময়ে এবং 'রুক্মিণী হরণ' প্রথম যাত্রাপালা। শ্রী চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের আগেও রাঢ়, বঙ্গ সমতট, গৌড় চন্দ্রদ্বীপ, হরিকেল শ্রীহট্রসহ সমগ্র ভূখণ্ডে পালাগান ও কাহিনী কাব্যের অভিনয় প্রচলিত ছিল। বঙ্গদেশে শিবের গজল, রামযাত্রা, বেষ্টযাত্রা, সীতার বারোমাসী, রাধার বারোমাসী, নৌকাবিলাস, নিমাই সন্ন্যাস, ভাওয়াল সন্ন্যাস ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতকে যাত্রা বাংলার ভূখণ্ডে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যখন শিশুরাম, পরমানন্দ অধিকারী, সুবল দাস প্রমুখ ছিলেন যাত্রাজগতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব । ঊনবিংশ শতকের শেষে যাত্রায় পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক পালা এবং বিংশ শতকের শুরুতে যাত্রায় দেশপ্রেমমূলক কাহিনীর অভিনয় শুরু হয়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মীর মোশারফ হোসেনের বিষাদসিন্ধু কাহিনী অবলম্বনে যাত্রা অভিনিত হয়েছিল। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রখ্যাত পালাকার বরিশাল নিবাসী শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত বাগদত্তা, গরিবের মেয়ে, গলি থেকে রাজপথ, রিক্তা নদীর বাঁধ ইত্যাদিসহ আরও অগণিত পালা গ্রামবাংলার মানুষের মনে এখনো স্থান করে রেখেছে। বাংলাদেশের যাত্রাসম্রাট অমলেন্দু বিশ্বাস ও তার সহধর্মিনী জ্যোৎস্না বিশ্বাস তাদের যাত্রাদল চারুনিক নাট্যগোষ্ঠীর বিশেষত মাইকেল মধুসূধন পালাটি জনমনে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তা ছাড়া তোষার দাস গুপ্ত ও শর্বরী দাস গুপ্তর পরিচালনায় তুষার অপেরা, ময়মনসিংহের গৌরীপুরের নবরঞ্জন অপেরার মালিক চিত্তবাবু ও তদীয় স্ত্রী বীনা রানীর অভিনীত 'বাগদত্ত' এখনো দর্শকদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রোমান্টিকতার দিকে নিয়ে যায় ।

স্বাধীনতাপূর্ববর্তী ষাটের দশক কিংবা তারও আগে তখনকার মানুষের নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার মানসিকতা যেভাবে সমাজ-সংস্কৃতির জগৎকে প্রভাবিত করত, তা সত্যিই ছিল বিস্ময়কর। তখন প্রতিটি জেলায় শীতের সময়ে প্রদর্শনী হতো, যেখানে যাত্রা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার পুতুল নাচ ছিল প্রধান আকর্ষণ। যাত্রা শিল্পের নান্দনিক ও শৈল্পিক মূল্যবোধই ছিল উদ্যোগক্তাদের প্রধান লক্ষ্য। তখনকার সময় প্রায় স্কুলেই যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হতো, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্থিকভাবে স্কুলকে সহায়তা করা এবং শিক্ষামূলকপালাগুলোই যেমন মাইকেল মধুসূদন, ভাওয়াল সন্নাসী, ভক্ত রামপ্রসাদ, গলি থেকে রাজপথ, আনারকলি ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় হাওড়বেষ্টিত অঞ্চলগুলোতে লোকসংস্কৃতিতে এত সমৃদ্ধ ছিল যে প্রায় প্রতিটি বাড়িতে গানবাজনার আয়োজন থাকত এবং ভাসানযাত্রার আয়োজন হতো বিয়ে কিংবা পুজার আসরে। পূর্ব ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলের প্রকোপ খুব বেশি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসাহিত্যের অধ্যাপক ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের ময়মনসিংহের গীতিকার 'মহুয়া মলুয়া'র যাত্রাপালার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাতভর যাত্রাপালা উপভোগ মজাই আলাদা। একদিকে গানের কপেট অপরদিকে প্রমোটারের নির্দেশনা সবাইকেই কিছু সময়ের জন্য হলেও মুগ্ধ করে রাখত দর্শকদের। আবার গ্রামগঞ্জে প্রবাদ আছে 'যাত্রা শুনে ফাতরা লোকে'। যাত্রা একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতিয়ার

হলেও সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং এখানে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যাত্রাপালা। একটি অনবদ্য ভূমিকা ছিল, যা স্মরণে রাখার মতো। পশ্চিম বাংলার গ্রামেগঞ্জে শহরে 'আমি শেখ মুজিব বলছি' নামক তরুণ অপেরার যাত্রাপালা মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সেখানকার মানুষের তথা সমাজের সমর্থন জুগিয়ে ছিল।

এখন আমি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের যাত্রা শিল্পের অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করতে চাই। তখন সারা দেশে যাত্রা দলের সংখ্যা ছিল ৩০০-এর বেশি এবং আমরা রাজনৈতিক তথা ভৌগলিকভাবে একটি স্বাধীন দেশ পেলেও বিশ্বাস ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ মানুষগুলো তেমন দেখা যায়নি, যা যাত্রাশিল্পের উপড়েও পড়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেকে দেশ ছেড়েছে আবার অনেক সংগঠনসহ বাদ্যযন্ত্র কলাকুশলীগণ হারিয়েছে, যারা নতুন করে সংগঠন তৈরিসহ অর্থের বিনিয়োগসহ নতুনভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল, যারা সংগঠক হিসেবে আসল তাদের নৈতিক ভিত্তি পূর্বের মতো ছিল না এবং এতে নতুনভাবে যোগ হলো মুনাফা লোভ ও অশ্লীলতা। গ্রামীণ মেলাগুলোতে চলে জুয়ার হাউজির আসর ও অশ্লীল নোংরা নৃত্য। এ কারণে শুরু হয় যাত্রার ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং সত্তরের দশকের শেষের দিকে এটি চরম রূপ নেয় এবং এই ধারা পড়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলতে থাকে। সাধারণ আগ্রহী দর্শকেরা যাত্রাপালার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ায় এই ব্যবসায় ধস নামে। বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প সমিতির সভাপতি ও দেশ অপেরার মালিক বিমল কান্তি বলেন, যাত্রা শিল্পের সোনালী দিন ছিল ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত, যখন যাত্রাদলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তিন শতাধিক এবং শিল্পকলা একাডেমিতে নিবন্ধিত দলের সংখ্যা ছিল ১১১টি কিন্তু। কার্যত টিকে আছে ৩০টি মতো দল ও তিন বছর ধরে যাত্রাপালা বন্ধ ছিল ।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে সাত মাস (আশ্বিন থেকে চৈত্র মাস) যাত্রাভরা মৌসুম যার শুরুটা হয় দুর্গা পূজায় আর শেষ হয় পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কিন্তু প্রশাসন এখন আর যাত্রাগান আয়োজনে অনুমোদন দিতে আগ্রহী নয় নিরাপত্তাজনিত কারণে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রতিবছর যাত্রাদলের নামে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক যাত্রাদলের কাছ থেকে নির্ধারিত ফি বাবদ টাকা গ্রহণ করে থাকে। অথচ এই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শিল্পের উন্নয়নে কোনো কাজ করে না। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের ৪৮ বছরে মাত্র পাঁচবার জাতীয়ভাবে যাত্রা উৎসব শিল্পকলা একডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এবং প্রথম বছরটিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল খুলনার শিরীন অপেরার অভিনীত 'নিহত গোলাপ' পালার জন্য। তারপর সর্বশেষ ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত শিল্পকলা একাডেমী ঢাকার বাছাই করা সাতটি দল নিয়ে তিনবার যাত্রা উৎসব করেছিল। কিন্তু এরপর এই প্রতিষ্ঠানটির আর তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এই শিল্পের নেতারা বলছেন, প্রতিটি দলে শিল্পী ও কলাকুশল নিয়ে প্রায় অর্ধশতাধিক লোক, যাদের মধ্যে কেউ বংশীবাদক, তবলচি, করোনেট বাদক, প্রম্পটার ইত্যাদি। এই হিসাব যদি সত্যি হয়, তবে তিনশত দলে সারা দেশে প্রায় ১৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান তথা জীবন-জীবিকা এই শিল্পের সাথে জড়িত। নিয়মিত পালা না হওয়ায় এ পেশার সাথে সম্পৃক্ত অভিনেতা অভিনেত্রী গায়ক বাদক পালাকাররা চলে যাচ্ছে পেশা ছেড়ে এমনকি দেশ ছেড়ে। এখন পর্যন্ত যারা টিকে আছে কোনো ভাবে তাদের সংখ্যা ১০টির মতো।

এমতাবস্থায় বিলুপ্তি হয়ে যাচ্ছে বাঙালির এককালের বিনোদনের প্রাধান অনুষঙ্গ যাত্রাপালা। আকাশ সংস্কৃতির প্রভার, হাতের কাছে বিনোদনের সহজলভ্যতা, অশ্লীল নৃত্য আর জুয়ার আর্বতে পড়ে বাঙালির লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য আজ সংকটাপন্ন। এদিকে নেত্রকোনার যাত্রাশিল্পী গৌরাঙ্গ আদিত্য আমাকে

জানালেন, খুবই করুণ অবস্থা দিন কাটাতে হচ্ছে গানের টিউশনি করে। অথচ এককালে বিবেকের অভিনয় করে সুরেলা কণ্ঠে আসর মাতাতেন সেই গৌরাঙ্গ। একসময় দেখা যেত যাত্রার ওপর বাংলাদেশ টেলিভিশনএ এক সপ্তাহে না হলেও মাসে দু-একবার অনুষ্ঠান হতো কিন্তু এখন আর হয় না। পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে রমনা বটমূলসংলগ্ন মাঠে যাত্রাপালার আয়োজন করা হতো। কিন্তু এখন আর দেখা যায় না। যারা পালাকার ছিল, তারা আর নেই। যারা নৃত্যের মাস্টার ছিল, তারা পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে গেছেন। যারা বাদ্যযন্ত্রী ছিল, তারা মারা যাওয়ায় তাদের প্রজন্ম এ পেশায় আসতে ইচ্ছুক নয়। এমতাবস্থায় এসব পেশা যদি আকর্ষণীয় না করা যায়, তবে শিল্প হিসাবে এর বিকাশ কোনোভাবেই সম্ভব হবে। না এই অপসংস্কৃতির যুগে এখন প্রয়োজন দেশীয় লোকজ সংস্কৃতি রক্ষায় সবার ঐকমত্য বিশেষত শিল্পী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে, যা সময়ের দাবি এবং এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো—

(১) সরকারি বাজেটের আওতায় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া যাত্রাশিল্পের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়, এটাই সত্যি। এখন বিষয়টি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতায় শিল্পকলা একাডেমী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যারা প্রতিবছর যাত্রাদলগুলোর কাছ থেকে নিবন্ধন নিয়ে থাকে। সত্যি কিন্তু তার পরিবর্তে যাত্রা দলগুলো কী সুবিধা ভোগ করছে তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক প্রতিষ্ঠানকে তাদের বাজেট থেকে অনুদান দিয়ে থাকে যেমন ধর্মীয়প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। তাই যদি হয় তবে লোকজ সংস্কৃতির বাহক হিসাবেযাত্রা দলগুলো তাদের সংগঠিত করার জন্য সরকারি অনুদান পেতে পারে, যা সময়ের দাবি। সম্প্রতি আগামী বছরের বাজেট ঘোষিত হয়েছে যেখানে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বাজেট খুবই অপ্রতুল, যা দিয়ে যাত্রা শিল্প উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশ যাত্রা শিল্প উন্নয়ন সতিতিও সময় সময় একই আশা ব্যক্ত করে থাকে। যেমন বর্তমান সরকার বিগত ১৩ জুন ২০১৯ ঘোষিত ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় সংসদে যে ৫ লাখ ২৩ হাজার ১৯৪ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছে, যা বর্তমান অর্থমন্ত্রীর প্রথম বাজেট উপস্থাপন, বর্তমান সরকারের ধারাবাহিকভাবে ক্ষমতায় আসীন হওয়ার ১১তম বাজেট এবং স্বাধীন বাংলাদেশের ৪৯তম বাজেট উপাস্থাপন। এই বাজেট উপস্থাপনায় ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৮১০ কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা, ২,০৭,৭২১ কোটি টাকা। উন্নয়ন খাতের লক্ষ্যমাত্রা আর ১,৪৫,৩৮০কোটি টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে যার বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাজেটের সম্পদের ব্যবহারে বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম খাতে রয়েছে মাত্র ০.৯ শতাংশ এবং পরিচালন খাতে রয়েছে ০.৮%। এখানে উল্লেখ্য, একটি যাত্রা দলের আধুনিকায়নের জন্য বিনিয়োগের একটি বড় অংশ যায় পোশাক তৈরিতে, যা আবার ঐতিহাসিক পালা কিংবা সামাজিক পালার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়, যা মালিকের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই মোটা অনুদান কিংবা সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ এক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

(২) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নাট্যকলা বিভাগ যাত্রাশিল্পীর ক্ষেত্রে এত উদাসীন কেন? এই প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে এবং কেবল উদ্যোগের অভাবে আগের জাতীয় যাত্রা উৎসব আয়োজনে তারা পিছপা হচ্ছে, যা সংস্কৃতির অঙ্গনের জন্য ক্ষতিকর। দর্শকের কাছ থেকে যে চাঁদা আহরিত হবে, তা দিয়ে এসব আয়োজনের খরচ মেটানো সম্ভব। অথচ এর সামাজিক-সাংস্কৃতিক মূল্য অনেক বেশি এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজের দক্ষতাকে প্রমাণ করে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির এক অপূর্ব মাধ্যম বলে বিবেচিত। শিল্পকলা একাডেমী কর্তৃক পুরস্কার একটি দলের ফেস ভ্যালু বাড়াতে সহায়ক। অনেক দিন পরে হলেও বাংলাদেশের যাত্রা সম্রাজ্ঞি জোৎসনা বিশ্বাসকে সরকার একুশে পদকে ভূষিত করে যাত্রা শিল্পকে সম্মানীত করেছে। এই ধরনের পুরস্কার মরণোত্তর হলে চারনীকের প্রতিষ্ঠাতা অমলেন্দু বিশ্বাসও পেতে পারে। তাঁর সুযোগ্য কন্যা অরুণা বিশ্বাস বর্তমান চলচিত্রের সাথে জড়িত রয়েছে।

(৩) যাত্রা, চলচিত্র, নাট্যকলা, সংগীত প্রভৃতির সমধর্মী হলেও এদের মধ্যে পদ্ধতিগত কিংবা শ্রেণিগত পার্থক্য রয়েছে। একমাত্র যাত্রা শিল্প ছাড়া অন্য শিল্পগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব ইনস্টিটিউট রয়েছে, যার মাধ্যমে এসব শিল্পের কলাকুশলীরা প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও গবেষণা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত ও নাট্যকলা বিভাগ রয়েছে। নাট্যকলার হিসাবে যাত্রা বিষয়ে কোনো পড়াশোনা কিংবা প্রশিক্ষণ আছে বলে মনে হয় না। এমনকি শিল্পকলা একাডেমী এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও এ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ভাবনার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় বদ্ধ পরিকর। সেই হিসাবে সুস্থ ধারার সংস্কৃতিক চর্চা পালনে নীতি সহায়তা প্রদান সরকার করে যেতে পারে যদিও এর বাস্তবায়ন প্রশ্ন বিদ্ধ হতে পারে।

(৪) সমালোচকেরা বলছেন, সমসাময়িককালে যাত্রাশিল্পের অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পথে ধাবিত হওয়ার মূল কারণ অসাধু যাত্রাপালার ব্যবসায়ীদের প্রিন্সেস আমদানি আর জুয়া হাউজি চালু, যা পূর্বে ছিল না। এসবই চিরায়িত যাত্রাপালার মৃত্যুর কারণ। প্রশাসন এ ব্যাপারে কঠোর হলেও স্থানীয় সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের সহায়তায় এই অশুভ কাজগুলো চলতে থাকে জেলা উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসন যদি সক্রিয় হয় তবে স্থানীয় জনগনকে সম্পৃক্ত করে সুস্থ ধারার যাত্রা পালা আয়োজন করা সম্ভব হবে। কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের মাধ্যমে নয়।

(৫) যাত্রাপালা সাহিত্য-সংস্কৃতির তথা লোকজ শিক্ষার বাহক বিধায় এর ওপর প্রয়োগধর্মী গবেষণা একেবারেই অপ্রতুল এমনকি দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়টির তেমন কোনো উপস্থিতি লক্ষণীয় হয় না, যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি দুর্বল দিক। আবার যারা সাহিত্য কিংবা নাট্যকলা বিভাগে গবেষণা করে তাদের যাত্রাশিল্পের ওপর এমফিল কিংবা পিএইচডি করতে দেখা যায় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চতর গবেষণা বিভাগগুলোকে এই বিষয়ে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৬) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী বাংলাদেশের যাত্রা দলগুলোর ওপর একটি পুঞ্জিকা বা ডাইরেক্টরি তৈরি করতে পারে, যেখানে তাদের দাপ্তরিক ঠিকানাসহ কলাকুশলীদের জীবনবৃত্তান্ত ও পালাকারদের পরিকল্পনা উল্লেখ থাকবে। সর্বশেষ বলা যায় যে সরকার এই প্রাচীন শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখবে তার বাজেটারি কাঠামোতে এবং যাত্রা শিল্প ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হতে পারে, যা শিল্পী কলাকুশলীদের প্রশিক্ষণ তথা গবেষণার ক্ষেত্র হতে পারে।

৩. উপসংহার

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি ও বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে চলচ্চিত্রকে বঁচিয়ে রাখতে হবে অর্থনীতির স্বার্থে। কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে হাজার মানুষের জীবন ও জীবিকা। তা ছাড়াও মনের স্বাস্থ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলেও এর কোনো বিকল্প নেই ।